নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়
(Civic Problems and Our Duties)

ইউনিট ৯

প্রতিটি রাষ্ট্রকেই কম-বেশী নাগরিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তবে উন্নত রাষ্ট্রের সঙ্গে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর প্রধান নাগরিক সমস্যার কিছু মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে অধিকাংশ নাগরিক সমস্যার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সুশাসনের অভাব। ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশ অসংখ্য নাগরিক সমস্যা মোকাবেলা করছে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ নাগরিক সমস্যা মোকাবেলায় বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। তবুও অতিরিক্ত জনসংখ্যা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, যানজট, পয়:নিষ্কাসন প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশের জনগণকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই ইউনিটে জনসংখ্যা সমস্যা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার
(Population Problem and Its Remedy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঘনত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশে ২০১১ সালের আদম শুমারি অুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। বর্তমানে এ সংখ্যা আরো বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানে প্রতি বর্গ কলোমিটারে ১৩০০ জন বাস করে। এমন ঘনবসতির দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের মধ্যেই অবস্থান করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে নিম্নলিখিত কারণ রয়েছে–

১. দারিদ্র্য

দারিদ্র্যের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। দরিদ্র পিতা-মাতা স্বভাবতই অধিক সন্তান দ্বারা পরিবারের আয় বৃদ্ধি করতে চায়। তারা চিন্তা করে অধিক সন্তান মানেই অধিক কর্মক্ষমতাও উপার্জন। উপরন্তু বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার জন্যও তারা অধিক সন্তান জন্ম দেয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেক দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না। বাংলাদেশে ধনিক ও মধ্য শ্রেণীর তুলনায় দরিদ্র বস্তি ও গ্রামীণ জনপদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

২. বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ

বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ ও একাধিক বিবাহ খুবই বেশি। এক দিকে সামাজিক পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতার অভাব, ইভটিজিং, যৌন হয়রানির ভয় এবং অন্যদিকে সন্তানকে অপরাধমুক্ত রাখার তাড়না থেকে পিতা-মাতা তাদের ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলে এই প্রবণতা খুব বেশি । এতে করে দম্পতিরা অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য বেশি সময় পায়।

৩. নিরক্ষরতা

বাংলা*দেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ অনুযায়ী* বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ এখনো নিরক্ষর। শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতার জন্য এইসব মানুষ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে প্রায় অক্ষম। নিজের আয়, সামর্থ্য, সঙ্গতির সাথে সম্পর্ক রেখে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি তারা নির্ধারণ করতে পারে না। এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে।

৪. পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা

বাংলাদেশে বহু পরিবার পুত্র সন্তান লাভের আশায়, উত্তরাধিকার নির্ধারণের স্বপ্নে অধিক সন্তান জন্ম দেয়। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ, নতুন করে বিয়ে কিংবা বহু বিবাহের আশ্রয় নেয়। বহু বিবাহের ফলে এভাবেই জনসংখ্যা বেড়ে চলে।

৫. মৃত্যুহার হ্রাস

চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। আগের তুলনায় স্বাস্থ্য, রোগ ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বেড়েছে। ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও, ডিপথোরিয়া, ডায়ারিয়াসহ বহু কঠিন রোগে মৃত্যুহার একেবারেই কমে গেছে। ১৯৭২ সালে হাজারে শিশু মৃত্যু হার ছিল ৩৪০ জন। ২০১৫ সালে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে তা ২৪-এ নেমে এসেছে। শিশু মৃত্যুহার কমলেও জন্মহার কমেনি। এটাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

৬. পরিবার পরিকল্পনার অভাব

স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা শুরু হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে এর সাফল্য খুব বেশী নয়। জন্ম শাসন সম্পর্কে দরিদ্র ও বস্তিবাসীর পরিষ্কার বোধ আসেনি। এতে করে গ্রামাঞ্চলে শহরের বস্তি এলাকায় এবং অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত পরিবেশে জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। 'একটি সন্তান কাম্য, দুটি সন্তান যথেষ্ট' এই শ্লোগান গ্রামবাসী ও দরিদ্ররা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেনি। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে শিক্ষা সচেতনতা ও উদ্যোগের প্রয়োজন তা বাংলাদেশে অনুপস্থিত।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বিপুল পরিমাণ এ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে গুলো হল:

১. জনসংখ্যার পুন:বণ্টন

আমাদের দেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান এক রকম নয়। তাই যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করতে হবে। ফলে জনগণের কর্মসংস্থান হবে এবং জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

২. জনশক্তি রপ্তানি

বিপুল জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম শ্রমিকের প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পশ্চিমের উন্নত দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়বে আর বেকারত্ব দূর হবে। এভাবে জনসংখ্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

৩. শিক্ষার প্রসার

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত নারী-পুরুষ নিজেরাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দেয়।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বাড়বে। ফলত দারিদ্র্য-যা কিনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তা এমনিতেই কমে যাবে।

৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। তাঁরা বলেন, 'একটি সন্তান কাম্য দুটি যথেষ্ট' এ শ্লোগান বাংলাদেশে সামাজিকভাবে জনপ্রিয় করতে হবে।

৬. জনসংখ্যানীতি গ্রহণ

১৯৭৬ সালের জনসংখ্যানীতিকে আরও সংস্কার করে ২০০৪ সালে সরকার নতুন জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে। তবে তা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন ভূমিকা রাখছে না। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর গণচীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। বাংলাদেশ সরকারকেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সেবা বঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান উন্নত করতে হবে। গরিব ও দুস্থদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

নানাবিধ কারণেই বাংলাদেশে জনসংখ্যা অতি বৃদ্ধি ঘটছে। তাই জনসংখ্যার এ বিস্ফোরণ হ্রাসে জনগণ এবং সরকার উভয় পক্ষের আরো সচেতন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা , পরিবার পরিকল্পনার অভাব, বাল্যবিবাহ, চিকিৎসা, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই রাষ্ট্রে সরকারি কার্যকর উদ্যোগ, শিক্ষার প্রসার সর্বোপরি পরিবার পরিকল্পনার প্রসার জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে ভূমিকা রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ সর্বশেষ জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে কোন্ সালে?

ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৮ গ. ২০০৪ ঘ. ২০১৪

২। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কত?

ক. ৬৫ শতাংশ খ. ৪৫ শতাংশ গ.৩৫ শতাংশ ঘ. কোনটি নয়

পাঠ-৯.২ খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শর্ত, খাদ্য সম্মেলন, শারীরিক, পর্যাপ্ত, হুমকি, জলবায়ু পরিবর্তন, উদ্বাস্তু

খাদ্য নিরাপত্তা হল স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। বাংলাদেশে জাতীয় খাদ্য নীতিতে (২০০৬) খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি শর্ত হল: খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্য ভোগ। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নে সবক'টি শর্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭০ এর দশকে জাতিসংঘ প্রথম খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত হয় বৈশ্বিক খাদ্য সম্মেলন (world food summit)।
পরবর্তীতে জাতিসংঘ ১৯৮০'র দশকে খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্লেষণে তিনটি সূচকের কথা বলে। এগুলো হল- খাদ্যের পর্যাপ্ততা (availability of food) খাদ্য প্রাপ্তি (access to food) এবং খাদ্য বাজারের স্থিতিশীলতা (stability of food market)। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত খাদ্য নিরাপত্তা নীতিতে স্বাক্ষর করে।
১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ও বিশ্বস্বীকৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। কিছুটা পরিবর্তনও আনা হয় পূর্ববর্তী ধারণায়। নতুন ধারণায় বলা হয়, 'খাদ্য নিরাপত্তা তখনই থাকবে, যখন সব মানুষ সবসময় শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ, পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করতে পারবে। যে খাবার শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি মানুষকে কর্মক্ষম ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী করবে।' ওপরের সংজ্ঞাটি খাদ্য নিরাপত্তার চারটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা তুলে ধরেছে। প্রথমত, খাদ্যর সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সামাজিক ও শারীরিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকতে হবে। তৃতীয়ত, খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবহার হতে হবে। চতুর্থত, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের স্থিতিশীলতা থাকতে হবে। বাংলাদেশের মতো দেশে খাদ্য নিরাপত্তা যাচাই করার জন্য এ চারটি মাত্রা ব্যবহার করা জরুরি। বস্তুত খাদ্যে নিরাপত্তাকে তিনটি প্রধান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করা হয়। আর এগুলো হল-

খাদ্যের পর্যাপ্ততা (food availability), খাদ্য প্রবেশাধিকার (excess to food) এবং পুষ্টি ও ভোগ (utilization and nutrition)। খাদ্যের পর্যাপ্ততা বলতে বুঝায় খাদ্যের প্রচুর উৎপাদন ও বাজারে খাদ্যের ব্যাপক উপস্থিতি। এটি দু'ভাবে অর্জিত হয়: প্রথমত, দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে দ্বিতীয়ত, আমদানী কিংবা বৈদেশিক খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে। খাদ্য প্রবেশাধিকার মানে খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা বা খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি। অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যের প্রচুর সরবারাহ সত্ত্বেও অর্থের অভাবে জনগণের একটি বড় অংশ খাদ্য না পেতে পারে। বাংলাদেশে ৩০ ভাগ মানুষ কিংবা আফ্রিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর নির্মম উদাহরণ। এজন্য খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্যক্তির খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা। অন্যদিকে, পুষ্টি ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ ও সুষম বিন্যাসের উপরই নির্ভর করে।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার চালচিত্র

গত চার দশকে দারিদ্র্য অর্ধেক কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে উচ্চ জন্মহারের কারণে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিচারে ভারত ও চীনের পর বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা চরম অনিশ্চিত। পুষ্টিহীনতার বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম। প্রসূতি মা ও শিশু মৃত্যুর হার এখনও বেশি। বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম

ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। এ কারণে বাংলাদেশের পক্ষে নতুন করে কৃষি জমি বাড়ানো সম্ভব নয়। কেবল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার কওে উৎপাদন বৃদ্ধি করেতে হবে।

বাংলদেশের প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি সেচের আওতাভূক্ত। সেচ সুবিধার কল্যাণেই বরো ধানের (প্রধান শস্য) উৎপাদন বাড়ছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা আর ভূ-গর্ভস্থ পানি দেশের সেচের অন্যমত উৎস। চীন-ভারত এ অববাহিকায় প্রায় দুই শত বাঁধ তৈরী করে পানি তুলে নেবার পরিকল্পনা করছে। আবার বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। এ দুটি বিষয়ের কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পানি চাহিদা ও সেচ ব্যবস্থা চরম হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেজ্ঞরা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এসব জমি এখন কৃষি ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জাতিসংঘের হিসাব মতে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১ কোটি। সঙ্গত কারণেই চরম হুমকির মুখে পড়বে উদ্বাস্তু এ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

খাদ্যনিরাপত্তার তিনটি শর্ত হল: খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্য ভোগ। প্রত্যেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ অর্থে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বলতে বুঝায়
ক. খাদ্য ভোগের ক্ষমতা খ. খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা গ. খাদ্যের পর্যপ্ততা ঘ. কোনটি নয়

২। বাংলদেশের কত ভাগ ভূমি সেচের আওতাভূক্ত?
ক.৭০ ভাগ খ. ৮০ ভাগ গ. ৯০ ভাগ ঘ. শতভাগ

পাঠ-৯.৩ সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার (Terrorism: Causes and Remedies)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে সন্ত্রাস, এর কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সন্ত্রাস দমনের বা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন বিরোধী, সামাজিকীকরণ, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খল, নীতিহীন, প্রতিকূল

সন্ত্রাস হল অন্যায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আদায়। শারীরিক বা অস্ত্রের শক্তি, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি দিয়ে জবরদস্তি করে অন্যায়ভাবে কিছু সমাধা করা, আদায় করা, অন্যের সম্পদ দখল করা, ছিনতাই করা, লুট করা হল সন্ত্রাস। অর্থাৎ সন্ত্রাস মানেই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ। এটি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নির্যাতনকারী। সন্ত্রাস- পেশী শক্তি, অন্যায় আচরণ ও জোর যার মুল্লুক তার নীতির মত। সন্ত্রাস সমাজ, জাতি, দেশ, রাষ্ট্র ও সভ্য মানব সমাজের শত্রু।

সন্ত্রাসের উৎস ও কারণ

সন্ত্রাসের মতো গুরুতর অপরাধের উৎস বহুমুখী। নিম্নে সন্ত্রাসের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থ

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অর্থ ও সম্পদের প্রবাহ অনিশ্চিত ও অস্থির। অনুন্নত দেশের সীমিত সম্পদ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদাপূরণ করতে পারে না। ফলে এসব জনপদে জোরপূর্বক অপরের সম্পদ দখলে নেবার অবস্থা তৈরি হয়। সমাজে যে কোন মূল্যে আইন-কানুন লঙ্ঘন করে হলেও অর্থ-সম্পদ দখলের সংস্কৃতি গড়ে উঠে।

২. পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব

ভুল সামাজিকীকরণের ফলে শিশু বা কিশোরের মনে সন্ত্রাস বিকশিত হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে যখন শিশু বড় হয়ে উঠে, যখন নৈতিকতা, নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করে না, তখন সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াতে তার দ্বিধা হয় না। সহজেই সন্ত্রাসকে সে জীবিকার্জনের, সম্পদ দখলের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। পারিবারিক প্রভাবও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা সন্ত্রাসীর ছেলে-মেয়ের সন্ত্রাসী হবার সম্ভাবনা থাকে। অপরাধীর সন্তানরা সন্ত্রাসী হবেই সেটি ঠিক নয়; তবে সন্ত্রাসী পরিবারের একটি শিশুকে সহজেই সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসীর জন্ম এভাবে হয়ে থাকে।

৩. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হতে মুক্তি পেতে বহু লোক সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। এছাড়া বেকারত্ব এবং বঞ্চনাও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বেকার থাকলে, বঞ্চিত হলে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দিকে এগিয়ে মানুষ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়ে।

৪. সামাজিক দুর্বলতা ও নৈতিক শিক্ষার অভাব

পরিবারের ভাঙ্গন, অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষার অভাব সন্ত্রাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী। যখন সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ, মমতা থাকে না, যখন পিতা-মাতা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষে নিয়ম-নীতিহীন কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই পরিবারের সন্তানরা আইনকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে না। অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বস্তির জীবন মানুষের

দেহ ও মনের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। এগুলো মানুষের মধ্যে, হিংসা, নীতিহীনতা, অসভ্যতা, মস্তানী ইত্যাদি জন্ম দেয়। বাংলাদেশে প্রতিকূল সামাজিক অবস্থা, সুন্দর জীবনবোধ ও নৈতিকতার অভাব সন্ত্রাসের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়-

১. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ
২. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধকরণ
৩. নৈতিক শিক্ষার প্রসার
৪. ঝড়ে পড়া শিশু ও কিশোরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও পুলিশ প্রশাসনের পুনগর্ঠন
৬. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিয়মিত সাড়াশী অভিযান পরিচালনা
৭. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালান বন্ধকরণ
৮. ছেলে-মেয়েদেরকে পারিবারিকভাবে আরও সময় দেয়া

শিক্ষার্থীর কাজ	পারিবারিক সন্ত্রাস কীভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে?

সারসংক্ষেপ

সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক ও নাগরিক সমস্যা। কেউ সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম নেয় না; পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, সামাজিকীকরণ, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে। কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের নিশ্চয়তা। সুন্দর কর্মক্ষেত্রের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এবং সন্ত্রাসীদের দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে বিচারের আওতায় আনলে সন্ত্রাস অনেকখানি দূর হবে বলে আশা রাখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্‌টি সত্য নয়?
ক. সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা
খ. সন্ত্রাস দূর করতে দরকার নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ
গ. সন্ত্রাসীর সন্তান অবশ্যই অপরাধী হবে
ঘ. দারিদ্র্যের সঙ্গে সন্ত্রাসের সম্পর্ক রয়েছে

২। সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় নয় কোন্‌টি ?
ক. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালান বন্ধকরণ
খ. পুলিশ প্রশাসনের পুনগর্ঠন
গ. ঝড়ে পড়া শিশু ও কিশোরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
ঘ. বস্তি উচ্ছেদ

পাঠ-৯.৪ পরিবেশগত বিপর্যয় (Environmental Degradation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশগত বিপর্যয় কী জানতে পারবেন।
- পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- পরিবেশগত বিপর্যয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো কী বুঝতে পারবেন।
- পরিবেশগত বিপর্যয় প্রতিরোধে করণীয় জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অপরিকল্পিত, রাসায়নিক, দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সমষ্টিগত, বর্জ্য শোধনাগার

আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। অর্থাৎ আমাদের চার পাশের ঘরবাড়ি, দালান কোটা, নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ প্রধানত প্রাকৃতি পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ। জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের তাগিদে মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবেশের পরিবর্তন কওে যাচ্ছে। যার বেশির ভাগই প্রাকৃতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হলেই পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ

অপরিকল্পিত শিল্পায়নঃ যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা তৈরির ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এসব শিল্প কারখানার বর্জ্য, বাসায়নিক মিশ্রিত পানি ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্য মাটিতে ও পানিতে মিশে পরিবেশ দূষণ করছে। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্প কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের জন্য বর্জ্য শোধনাগার (Effluent Treatment Plant) কম থাকে। ফলে এসব শিল্প কারখানার বর্জ্য আশে-পাশের নদী-নালা খাল-বিলে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের মারাত্নক বিপর্যয় ঘটায়। যেমন- ঢাকার চার পাশের তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গার নদীর পানি খুব দূষিত। পরিবেশের বিপর্যয় এক অর্থে মানব জীবনেরই বিপর্যয়।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারঃ অধিক জনসংখ্যার জন্য অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে হয়। ফলে কৃষিতে বাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এসব সার ও কীটনাশক মাটি ও ফসলি জমির পানিকে দূষিত করে। সে পানি অনেক সময় নালা দিয়ে নদীর পানিকেও দূষিত করে। এ কারণে নদী-নালা ও জলাশয়ে প্রায়ই মাছ মরে ভেসে থাকতে দেখা যায়। শিল্পাঞ্চলের পাশ্ববর্তী জলাশয় ও নদীতে বর্তমানে মাছ নেই বললেই চলে।

বনভূমি ধ্বংস

রান্নার ও ইট ভাটার জন্য জ্বালানী হিসাবে, ভবন নির্মাণে দরজা- জানালার জন্য ও ঘরের আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যাপকহারে কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কোন দেশের ভূ-খন্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫ শতাংশ বনভূমি আর থাকছে না। বাংলাদেশে মাত্র ৯ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বাতাসে দূষিত গ্যাসের (কাবর্ন-ডাই অক্সাইড) পরিমাণ বাড়ছে।

মরণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার

বিভিন্ন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ সংঘাতও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। কেননা আধিপত্য বিস্তার করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের মরণাস্ত্র তৈরি করে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যেমন ক্লাস্টার বোমা, পারমাণবিক বোমা। পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের ভয়াবহতার কথা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসিকি শহরের বিস্ফোরণ থেকে জানা যায়।

অবকাঠামো তৈরি

অধিক হারে রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং, রেললাইন তৈরির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার

আধুনিকতার অনুষঙ্গ হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন- পলিথিন ব্যাগ, গৃহস্থালির আসবাবপত্র হিসেবে প্লাস্টিক সামগ্রী খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এটি সহজে মাটির সাথে মিশ্রিত না হওয়ায় পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে।

এছাড়াও খাল-বিল ও জলাশয় ভরাট, মানুষের অধিক গতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

ক্ষতিকর দিক

বর্তমান মাত্রায় পরিবেশ দূষিত হতে থাকলে পরিবেশ বিপর্যয় মানুষের জীবনের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। বিশেষ করে-

ক. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে।

খ. ক্যান্সার, স্নায়ুরোগ, চর্মরোগ, হরমোনজনিত রোগসহ নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে পাচ্ছে এবং দূষিত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাসহ নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ. জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপচে পড়া লবণাক্ত পানি দেশের নিম্নাঞ্চলের বসত বাড়ি, ফসলি জমি ও মানুষের জীবন সংকটে পড়ছে।

ঙ. খাদ্যের প্রাকৃতিক উৎস কমে পাচ্ছে। ফলে আফ্রিকার মত দেশগুলোতে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করছে।

চ. মরণাস্ত্র, শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস এর তেজস্ক্রিয়ায় শারিরীক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে।

পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবেলায় সমষ্টিগত উদ্যোগঃ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের ফলে বাংলাদেশের জন্য এইসব সমস্যা বিরাট বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। তাই বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি। এমন সব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা হলঃ-

১) সঠিক পরিকল্পনাহীন শিল্প ও কলকারখানা আইন করে বন্ধ করতে হবে।

২) শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

৩) পরিবেশ দূষণকারী শিল্পগুলো চিহ্নিত করে যে গুলো পরিবেশের সর্বাধিক ক্ষতি করছে সেগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।

৪) আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেয়া।

৫) বৃক্ষরোপণ আন্দোলন জোরদার করা এবং বৃহৎ বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬) সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা এবং সকলকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

৭) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

৮) পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যের ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।

৯) পাহাড় কাটা বন্ধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া।

১০) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং জৈব সার ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা।

১১) জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয়

পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বিনা প্রয়োজনে গাছ না কাটা, পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা, গৃহস্থালির ময়লা আর্বজনার সঠিক ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সহজেই করা যায়। নিজে

বৃক্ষরোপণ করা এবং অন্যকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা। কৃষি জমিতে রাসায়নিকের পরিবর্তে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা। বিস্তৃত পরিসরে গৃহনির্মাণ না করে উচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করা যেতে পারে। এছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা সচেতন হয়ে কাজ করলে পরিবেশ বিপর্যয় অনেকটাই কমানো সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার চারপাশে কি ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে? বর্ণনা করুন।

সার-সংক্ষেপ

আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবকিছু নিয়ে আমাদের পরিবেশ। মাটি, বায়ু, পানি, গাছপালা ইত্যাদি পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিল্পায়ন, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, বর্ধিত খাদ্য ও বাসস্থান চাহিদা প্রভৃতির কারণে পরিবেশের উপাদানগুলো নষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশগত দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোন্‌টি পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ?
ক) বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে যাওয়া খ) জলাশয় অধিগ্রহণ গ) দূষণ ঘ) সবগুলো।

২। পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য-
i) অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা বন্ধ করতে হবে।
ii) ব্যাপক আকারে বনায়ন কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।
iii) জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
iv) জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে

কোন্‌টি সঠিক
ক) i+ iii খ) iii+ii +i গ) ii + iv ঘ) সবকটি।

পাঠ-৯.৫ নিরক্ষরতা (Illiteracy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরক্ষরতা কী বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নিরক্ষরতা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবেন।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অক্ষর জ্ঞান, দরিদ্র, বৃত্তি, বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষা ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা,

নিরক্ষরতা একটি জাতীয় সমস্যা। এটি একটি জাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ। নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপকার করার চেয়ে বরং বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিরক্ষরতা হল অক্ষর জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ নিরক্ষরতা বলতে একজন ব্যক্তির সেই অবস্থাকে বোঝায় যার কোন অক্ষর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নামটিও লিখতে পারেন না। বাংলাদেশের গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর।

নিরক্ষরতা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সাল থেকে স্বাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয়। সম্পূর্ণ স্বাক্ষরতা আন্দলনের প্রতিপাদ্য হল দেশ থেকে নিরক্ষরতা সমূলে দুর করা। বাংলাদেশে ৭ বছর থেকে উর্ধ্বে স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৫৩% এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে এর হার হচ্ছে যথাক্রমে ৬০.১৫% এবং ৫৪.৮৪%। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশি। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেক দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারছে না। বর্তমানে বহু দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী অর্থের অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারছে না। অভাব-অনটনের মধ্যেও এস. এস. সিতে ভাল ফলাফল করেছে এমন মেধাবীদেরকে আবার বিভিন্ন ব্যক্তি, বেসরকারি ব্যাংক ও বৃত্তি প্রদানকারী ফান্ড অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের লেখাপড়ায় সহায়তা করছে। আশার কথা হল, বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার দিন দিন কমছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। ফলে নিরক্ষর সমাজ কখনোই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না। কিন্তু একটি জাতিকে শিক্ষিত করা ও নিরক্ষতা দূর করা খুব কষ্টসাধ্য কাজ। শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো বিষয় গুলো রাষ্ট্র নিশ্চিত করে থাকলের রাষ্ট্রের একার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তাই এ বিষয়ে সরকার ও নাগরিকের সমষ্টিগত উদ্যোগ জরুরি। ইউনেস্কোর ২০১৫ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৬১.৫%। অর্থাৎ বিশাল জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর। তাই এ বিষয়ে দ্রুত পরিকল্পিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকার ও নাগরিকগণ যে সব পদক্ষেপ নিতে পারে তা হল:-

ক) সঠিক পরিসংখ্যান

নিরক্ষর জনগণের সংখ্যা বয়স, অঞ্চল, নারী-পুরুষভেদে বিভিন্ন রকম হয়। এসব অবস্থা বিবেচনায় রেখে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। তাই নিরক্ষর জনগণের সার্বিক ও সঠিক তথ্য জানা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

খ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি

জনগণকে শিক্ষার সুফল ও নিরক্ষরতার কুফল সম্পর্কে জানতে হবে। তাদেরকে শিক্ষামুখী করার জন্যে প্রচারণা চালাতে হবে।

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

সরকারকে গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। এ জন্য যথাযথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত বেকারদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

ঘ) কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা

কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে। পেশাগত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

ঘ) বয়স্ক শিক্ষা চালুকরণ

বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা যায়।

ঙ) অনুদান ও শিক্ষা ঋণ চালুকরণ

নিরক্ষরতা দুর করার জন্য বৃত্তিমুলক শিক্ষা চালু করা যায়। তাছাড়া অনুদান, শিক্ষাঋণ প্রভৃতির দ্বারা লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা যায়। তাই সমাজের বিত্তবানদের এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

চ) শিক্ষা ব্যাংক চালুকরণ

শিক্ষা ব্যাংক চালুর করে নিরক্ষরদের ঋণ দানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যাবে। ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ব্যাংক কাজ করতে পারে।

ছ) নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা উপরকণ বিতরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। বেশ কিছু এনজিও যেমন– ব্র্যাক, প্রশিকা, ইউসেপ, সিডা, কেয়ার, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে "স্বনির্ভর বাংলাদেশ" নামে এনজিওটি ৫৭০ টি গ্রামকে নিরক্ষরমুক্ত করেছে। এভাবে সরকার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে নিরক্ষর মানুষ পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত হবে।

ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্টিগতভাবে হোক নিরক্ষরতা দূরীকরণে নাগরিকদেরকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভূমিকা পালন করতে পারি। জাতির মেরুদণ্ডকে আরও বিকশিত করতে হবে এবং শক্তিশালী ও উন্নত জাতি গঠন করতে নাগরিকদের আরও তৎপর হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরক্ষরতা দূরীকরণে বেসরকারি পর্যায়ে করণীয় কি কি?

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরতা জাতির জন্য অভিশাপ। নিরক্ষরতা বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। দরিদ্রতার কারণে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি। এছাড়া সচেতনতার অভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, বৃত্তির অভাবের কারণে জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থাকে। নিরক্ষরতা দূরীভূত করা সরকারের দায়িত্ব। বর্তমানে সরকার ও নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে নিরক্ষরতা কমে শিক্ষার হার বাড়ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে নিরক্ষরতা হার বেশি, কারণ
ক) নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা খ) জমির অভাব গ) শিল্পায়নের অভাব ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব

২। -------- মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও বেকারত্ব উভয়ই দূর করা সম্ভব।
ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খ) পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা
গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ঘ) ক + খ

পাঠ-৯.৬ নারী নির্যাতন ঃ কারণ ও প্রতিকার (Violence against Women: Causes and Remedies)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নারী নির্যাতন কী বলতে পারবেন।
- নারী নির্যাতন এর কারণগুলো চিহ্নিত হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেইজিং ঘোষণা, পুরুষতান্ত্রিক, ধর্মান্ধতা, পরাধীনতা, সচেতনতা

নারী সমাজের বিরুদ্ধে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শারীরিক যে কোন পদক্ষেপই নারী নির্যাতনের আওতাভুক্ত। বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোন কাজ বা আচরণকে বোঝায় যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয়। যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া কোন ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালীভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ নারী নির্যাতনের আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ

সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার সুরক্ষায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তারপরও সমাজে নারী নির্যাতন ঘটতে দেখা যায়। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের নিম্নলিখিত কারণ লক্ষ্যণীয়-

ক) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

আমাদের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সব সময় অবলা বলে বিবেচিত হয় এবং নির্যাতিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক এ ব্যবস্থা কখনো নারীর অধিকারকে স্বীকার করে না বরং নারীদেরকে অধিনস্ত করে রাখে। বাংলাদেশের একই অবস্থা এবং নারীরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত।

খ) অর্থনৈতিক পরাধীনতা

সমাজে এবং পরিবারে উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান শক্তিশালী করার মোক্ষম হাতিয়ার হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়। অথচ আমাদের দেশে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পিতা, স্বামী কিংবা পরিবারে অন্য পুরুষ সদস্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল।

গ) ধর্মীয় গোঁড়ামি

ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে নারীরা নির্যাতিত হয়। অনেক সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে গ্রাম্য সালিশে ফতোয়া জারি করে নারীদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়।

ঘ) দারিদ্রতা

দারিদ্রতা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। দরিদ্র পরিবারের নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনবোধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থেকে অন্ধকারে থাকে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালায়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে-

নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা

প্রথমত ভাবতে হবে নারী একজন মানুষ। তারও কিছু মানবাধিকার রয়েছে। নারীর উপর যেসব নির্যাতন হয় তার অধিকাংশই কোন মানুষের উপর করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমত নারীকে যদি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে নারী অনেক পাশবিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ

বিদ্যমান আইনের যথাযথ ও কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। তাই সরকারের গুরু দায়িত্ব হল বিদ্যমান আইনের দুর্বলতা গুলো খোঁজে বের করে তা আরও শক্তিশালী করা। প্রয়োজনে নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করতে হবে।

পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

নারীর প্রতি মানবিক হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ে বিশেষ আলোচনা উপস্থাপন করতে হবে। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে নারী নির্যাতন বিরোধী লেখা উপস্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তোলা

নারীর অধিকার আদায়ের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংগঠিত আন্দোলন। তাছড়া নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। নারীদেরকে অধিকার সম্পর্কে অবহিত করে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

আইনী সহায়তা প্রদান

নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা সহজলভ্য করতে হবে। তাছাড়া ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

নাগরিক হিসাবে আমাদের করণীয়

নারীরাও যে মানুষ এবং তারা পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ব্যাক্তি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমষ্টিগতভাবে নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের সৃজনশীল কর্মকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের চিন্তা, বিবেক ও কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেবল আইন প্রয়োগ করে কী নারী নির্যাতন প্রতিকার করা সম্ভব? যুক্তি দিন।

সারসংক্ষেপ

নারী নির্যাতন আমাদের সমাজের একটি মারাত্নক ব্যাধি। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণ হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি। তাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দুর করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ কি?

ক) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ খ) ধর্মীয় অন্ধতা গ) অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ঘ) ক+খ +গ

২। নারী নির্যাতন বন্ধে
i) আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।
ii) নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
iii) পুরুষদের মনস্বত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।
iv) নারীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
কোন্‌টি সঠিক
ক) i+ ii +iii খ) iv গ) ii + iv ঘ) সবগুলো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাবেয়া রসূলপুর গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে। দরিদ্রতার কারণে তার বাবা তাকে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু তার স্বামী কর্মঠ ছিল না। সে সব সময় রাবেয়াকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলত এবং চাপ দিত। টাকা না আনতে পারলে প্রচন্ড শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। এ অবস্থায় রাবেয়ার বাবা আইনের দারস্থ হয়। রাবেয়ার প্রতি নির্যাতন বন্ধ হয়।
ক) বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত ভাগ নারী?
খ) বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণগুলো কি কি?
গ) আলোচ্য উদ্দিপক নারী নির্যাতনের কোন হাতিয়াটিকে নির্দেশ করছে।
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে নাগরিকদের করণীয়গুলো আলোচনা করুন।

২। তালেবান একটি ইসলামী চরমপন্থী সংগঠন। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে এর বেশ প্রভাব রয়েছে। ২০১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে তালেবানের হামলায় পেশোয়ারের একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসহ ১৬২ জন নিহত হয়। পরবর্তীতে সেনা অভিযানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী শতাধিক জঙ্গিকে হত্যা করে এবং অনেককে ফাঁসি দেয়।
ক) সন্ত্রাস কী?
খ) সন্ত্রাসী কার্যকমের পাঁচটি উদাহরণ দিন।
গ) আলোচ্য উদ্দিপকে তালেবানরা কি ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে?
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬ : ১। ঘ ২। ঘ